আনন্দ ধারা

বার্ষিক পত্রিকা ২০২২-২৩

আনন্দ চন্দ্র কলেজ

কলেজপাড়া, জলপাইগুড়ি

Annual Students' Magazine 2022-23

Publisher :
Principal, Ananda Chandra College

Date of Publication :
13th February, 2023

Cover Page Design :
Kevin Ghosh (Sixth Semester, Zoology Department)

Composed by :
Ghosh Printing house
Panda Para, Jalpaiguri

Honourable Governing Body Members

Dr. Haraprasad Mishra, President, G.B.

Dr. Debashis Das, Principal & Sec. G.B.

Sri Bhaskar Sarkar, Member, G.B.

Sri Subrata Sur, Member, G.B.

Sri Bibekananda Adhikary, Member, G.B.

Dr. Debabrata Basu, Member, G. B.

Dr. Doli Dey, Member, G.B.

Dr. Diganta Chakraborty, Member, G.B.

Dr. Anuja Ray Chaudhury Member, G.B.

Dr. Ranjana Bhattacharjee, Member, G.B.

Sri Nirmalya Sarkar, Member, G.B.

Sohini Bal
Sixth Semester
English Department

"The academic career is a long distance race.
Step by step and day by day is the only way to succeed."

Dear students,

Education is the manifestation of love and the most cherished possession. It drives away ignorance and through illumination it emboldens man to a righteous thought and action. It energizes a society and enables a man to earn his living with respect and praise. In order to accomplish this vision and mission Ananda Chandra College has spearheaded the objective of enlightening the students-community of this region right from its inception in 1942 and since then it has relentlessly been serving to cater higher education not only in Jalpaiguri but across all the districts of North Bengal.

The experienced and dedicated faculties in all the departments are committed to the academic development of the students around the year. Besides, there are vibrant committees formed by the teachers and with their sincere efforts various programs are organized throughout the year for the development of co-curricular and extracurricular activities among the students, enabling them to move positively towards achieving their vision.The rich alumni in diverse fields like Administration, Politics, Education sector, Entertainment and sports are a testimony to this.

I am elated at the publication of college magazine for the academic year 2022-23. I sincerely hope that the magazine proves to be an enjoyable and useful apparat us in the hands of both students and teachers of the college. The publication of college Magazine shows that many of the teachers and the students have evinced interest and paraded their knowledge in creative writings and various fields of knowledge.

I express my deep sense of gratitude to the convenor and all the members of the magazine committee for giving the creative contributors an opportunity to bring out this magazine.

Dr. Debashis Das
Principal,
Ananda Chandra College

MAGAZINE SUB-COMMITTEE

Dr. Ranjana Bhattacharjee (Convenor)

Dr. Biswajit Roy (TCS)

Dr. Prosad Roy

Smt. Sangeeta Gupta

Dr. Sangita Das

Dr. Sudip Chakraborty

Dr. Munmun Roy

Sri Prasenjit Chakraborty

Sri Ripan Ghosh

Smt. Abira Sengupta

Sri Shibshankar Chowdhury

Smt. Asima Sarker

Smt. Jui Debnath

Sri Subal Chandra Barman

Dr. Shamim Akhtar Munshi

Sri. Samik Dasgupta

Dr. Diganta Chakraborty (Invitee)

Dr. Chinmoykar Das (Invitee)

Dr. Anuja Roy Choudhury (Invitee)

With active co-operation of the following students

Artik Ahmed

Santanu Dutta

Tomaghna Das

Debjani Chakraborty

Diti Sutradhar

আমাদের কথা...

এ বছরের সরস্বতী পুজোর আগে কিছু ছাত্রছাত্রী আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ও কয়েকজন অধ্যাপককে জানালো তারা এবার বার্ষিক কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করতে চায়। এধরনের উৎসাহব্যঞ্জক কাজে আমরা সকলেই রাজি হলাম ওদের সাহায্য করার জন্য। এতো অল্প সময়ে একই সঙ্গে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের দুটি পত্রিকা প্রকাশ খুব সহজ কথা নয়! যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা সংগ্রহের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করে শুরু হল বাছাই পর্ব। আমাদের ই-মেল ও হোয়াটসঅ্যাপ উপচে পড়লো ছাত্র শিক্ষকদের লেখার ভিড়ে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা পূর্ণতা পায় একটি কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায়। শহর জলপাইগুড়ি কিংবা পার্শ্ববর্তী মহকুমা শহর, চা-বাগান থেকে প্রতি বছর আনন্দ চন্দ্র কলেজের মতো উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসে। তাদের চিন্তা, চেতনার বিকাশ ঘটে তাদের স্বরচিত কবিতায়, গল্পে, ভ্রমণ কাহিনিতে, স্মৃতিকথায়, ছড়ায়। সাহিত্য বিভাগে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে আসে কবিতা লেখার স্বপ্ন নিয়ে। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায়। তাছাড়া আমরা প্রায়শই দেখেছি কলা বা বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের লেখা আমাদের অবাক করে দিয়েছে। 'আনন্দধারা' সেই অবকাশ তৈরি করেছে।

'আনন্দধারা' প্রকাশের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে, অধ্যাপকদের, শিক্ষাকর্মীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও পরিশ্রম ছাড়া পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো না। তাছাড়া পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও ছবি সহযোগে যারা সাজিয়ে তুলেছে সেইসব ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ নয় অনেক ভালোবাসা জানাই। অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই শিক্ষাকর্মী সহযোগীদের - যাঁরা আমাদের সব কাজের সারা বছরের সঙ্গী।

'আনন্দধারা'র ধারাবাহিক স্রোতে এভাবেই এগিয়ে চলুক...বেগবতী হোক। পৃথিবীর এক প্রান্ত আজকের দিনেও যুদ্ধরত। সিরিয়া তুরস্কের ভূমিকম্পে পৃথিবী রক্তস্নাত। তবু গোলাপের কাঁটাকে উপেক্ষা করে কলমের জোরে এভাবেই যেন আমরা গোলাপ ফোটাতে পারি। আমাদের ম্যাগাজিন থেকে গোলা-বারুদ নয় মুক্তচিন্তা নতুন ভাবনা সৃজনপ্রতিভার বিচ্ছুরণ অব্যাহত থাকুক।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
২৯ মাঘ, ১৪২৯

ড. রঞ্জনা ভট্টাচায
আহ্বায়ক
ম্যাগাজিন কমিটি

শুভেচ্ছা বার্তা

কলেজের সকল ছাত্র ছাত্রীকে আমার ভালোবাসা এবং শিক্ষক - শিক্ষিকা ও শিক্ষকর্মীদের আমার প্রণাম। এ ছাড়া পত্রিকা কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভাকে এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সমাজের কাছে পরিচিত করবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। আগামীদিনে আমার বিশ্বাস আমাদের আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বিশ্বের দরবারে ভালো লেখক-লেখিকা আমরা উপহার দিতে পারবো তোমাদের এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে।

এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

দেবজীৎ সরকার
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ (২০১৬-২০১৭)

Debjani Sarkar
Sixth Semester, B.A Pass

সূচিপত্র

কবিতা

১. যোদ্ধা - সৌমিতা দেব ১১
২. বন্দিনী - ঋষভ চক্রবর্তী ১১
৩. নব্য দোল- পৃথ্বীশ নিয়োগী ১১
৪.গোধূলিবেলা - তৃদিশা রায় সরকার ১২
৫. উপসংহারে নিঝুম রাত- মৈনাক সিনহা ১৩
৬.নাতিদীর্ঘ জীবনের অবশেষটুকু - আদৃতা দে রায় ১৩
৭.ফিরে গিয়েছিলাম - অহনা সোম ১৪
৮.চেনা অচেনা - শুভরাজ ১৫
৯. কংক্রিট - অনন্যা দাস ১৫
১০. আমাদের কথা - মেঘা ভট্টাচার্য ১৫
১১. অসুখ- পূজা নন্দী ১৬
১২. কল্পনা - রিপন ঘোষ ১৭
১৩. আমি দুলি হাঁসদা - শিবশঙ্কর চৌধুরী ১৭
১৪. জল শহর জলপাইগুড়ি - মৈনাক বর্মন ১৮
১৫. পুরোনো চিঠি - জয়ন্ত ভক্ত ১৮
১৬. Pain Paints Paintings - Akash Barat ১৯
১৭. Song of the Inevitable - Debaditya Chakraborty ১৯
১৮. Mask - Snighdhajyoti ২০
১৯. The Silent Sorro - Nikita Ghosh ২০
২০. Wanderer of the Dark - Susmita Barman ২১

ছড়া-

২১. শীতের সম্বল - প্রীতম মজুমদার ২২
২২. কলেজের প্রথম দিনটা - রিয়া খাতুন ২২

গল্প /অণুগল্প

২৩. অকাল বিসর্জন - প্রসেনজিৎ ঘোষ ২৩
২৪. কুমার গ্রামের ইতিবৃত্ত - মেহেবুব আলম ২৩
২৫. মন্দার - সূর্য্যদীপ্তা সরকার ২৪
২৬. Mirror - Asima Sarker ২৬

স্মৃতিকথা

২৭. এক যে আছে এ সি কলেজ - কৃষ্ণ রায় ২৮

প্রবন্ধ

২৮. Resonance of Tagore`s Philosophy in
World Economic Forum – Dr Sudip Chakraborty ৩১
২৯. Results Of The Students 2021-2022 ৩২

Sohini Bal
Sixth Semester
English Department

যোদ্ধা

সৌমিতা দেব
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

এক শ্রান্ত, ক্লান্ত যোদ্ধা আমি
এক অক্ষৌহিনী ফেরত ,
চোখে মুখে রক্তের ছাপ
পেরোচ্ছি এক এক ধাপ
উদ্দেশ্যেবিহীন যাত্রা,
নিরুদ্দেশের পথে
আগামীর অনুগামী
পথভ্রষ্ট বারবার
হার মানি না।
আমার দেবতা হার মানতে দেখায়নি।
শিখিয়েছে শত শত ক্রোশ অবলীলায় পার হতে।
আমি ক্লান্ত বটে, হেরো নই।

বন্দিনী

ঋষভ চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

আজও বন্ধ ঘরেতে, অটুট বন্দিনীর বিশ্বাস ।
খুঁজে চলেছে প্রতিবার, বাঁচার শেষ আশ্বাস !
হীরে খনিতে কয়লা খুঁজছে, ভাবনাতেই অপরূপ !
অতিক্রিয়াশীলতা জানে না, পরাধীনতার স্বরূপ !

আহা প্রতি রাতের অন্ধকার, তবুও তো ভালো !
শুধু মনে হিস্রতা জ্বালে, কী অস্বাভাবিক কালো ?
মুক্তি খুঁজছে বন্দিনী, বন্দি-দশা আলোহীন নিরেট !
প্রতি রাতে জ্বলছে আঁধার, জ্বালতে সিগারেট !

শেষ হতে উদগ্রাহী বিশ্বাসের আবার মন্ত্রণা।
যন্ত্রণা শেষে মুক্তি খোঁজার শুধু কি সত্ত্বনা ?
বন্দিনী যে শুধু বোঝোনি পরাধীনতার ছলনা;
হারিয়ে স্বাধীনতা, সে পতিত মিথ্যে ললনা !

নব্য দোল

পৃথ্বীশ নিয়োগী
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

রং নিয়ে ছিনিমিনি
ক্যানভাসে পরলো দাড়ি
এপার দেশের রং দিল
ওপার দেশে পাড়ি।।
নিম্নবর্ণের জাতিধর্ম
ধুলোয় গিয়েছে মিশে
রামধনু উঠেছে দেখো
রঙের নেশায় মেতে।
রক্তক্ষরা লাল বর্ণও আজ
হয়েছে সজীব
পিস্তলের প্রশ্বাসে আজ
বারুদ হয়েছে রঙিন।
সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মাঝে
দোলের পেন্ডুলাম দোলে
ফ্যাকাসে ন্যাপকিনে মোড়া পৃথিবীটাও আজ
রঙিন হতে চলে।
ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা কুনজরের চোখে
কে যে ছিটালো আবির
আদ্যিকালের ঝাপসা লেন্সটা যেনো
রঙে রঙে হল নবীন ।

গোধূলি বেলা

তৃদিশা রায় সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ, শরীরবিদ্যা বিভাগ

যাওয়ার বেলায় না হয় একটা অভিমানী গানের সুর আমায় দিতে পারতে,
যে গানের অংশবিশেষে আমি তোমায় খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতাম,
হাজার বছরের মন খারাপের মেঘ আমার নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই দিতে পারতে,
যে মেঘে বজ্রপাতের সাথে এক পশলা বৃষ্টি হয়,
সেই বৃষ্টিতে তোমায় হাতছানি দিয়ে অসময়ে ডাকতে পারতাম,
না হয় একটা শুকনো কাঠগোলাপের পাপড়ি দিতে পারতে,
আমার মধ্যবিত্ত সামর্থ্যের মাঝে আমি না হয় শুকনো কাঠগোলাপের ঘ্রাণে নিজেকে উন্মুক্ত করতাম,
অত্যন্ত তুচ্ছ একমুঠো ভালবাসা আমার নামে লিখে দিতে পারতে,
না আমি কোনোদিন তাতে অধিকার আদায়ে তৎপর হতাম না,
বরং সকাল সন্ধ্যে কাজের ফাঁকে অদৃশ্য সেই ভালোবাসায় সিক্ত হতাম,
বোধহয় তোমার কোনো দ্বিধাবোধ ছিল না,
তাই হয়তো যাওয়ার বেলায় অস্পষ্ট কারণের ঝুলি আর ভাঙা ভাঙা কিছু শব্দের মাধ্যমে
আমার চোখে ধুলোর আস্তরণ ফেলতে তোমার একটুও ভাবতে হয়নি,
মাঝে মাঝে আমি নিজেও অবাক হই জানো,
কি করে আমার সবটুকু আকাশসম ভরসা তোমার ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রমী চরিত্র পালন করেছিলো,
নয়তো আমার ডায়েরির পাতায় আজ দোলের আবির কিংবা মহালয়ার শিউলি জায়গা আদায় করে থাকতো,
অথচ কী অদ্ভুত দেখো আমার লেখার এই ক্ষুদ্র সংস্করনেও তোমার অধিকার প্রথম স্থান অর্জন করে নিয়েছে,
শূন্যতা টা অনেক বেশি হলেও কোথাও যেন আমার নিজের মতে আমাকে উৎসাহ প্রদান করতে
তুমি অনবরত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছ।
সেদিন হয়তো তোমায় কিছু বলা উচিত ছিল কিন্তু ওই যে তোমার মতে আমার যে সৌজন্য বোধ ,
সে কারণেই হয়তো বলতে পারিনি,
শুধু শুনে গেছি তোমার চলে যাওয়ার অসময়ী বার্তা।
রেখে দিয়েছি অজস্র স্মৃতির আয়না,যার মুখোমুখি হতে অভিমান হয় বড্ড,
কিন্তু সেই অভিমানের সংসার আজ একান্তই আমার ব্যক্তিগত
তাই সম্পর্কের গোধূলিবেলায় হাসি মুখে তোমায় প্রস্থানের অনুমতি দিলাম,
শুধু স্মৃতির আরশিতে রেখে দিলাম তোমার চলে যাওয়ার পদচিহ্ন।

উপসংহারে নিঝুম রাত

মৈনাক সিনহা
প্রথম সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ

প্রখর গ্রীষ্মের দিনগুলি ,
শীতের আগমনে শীতল হতে ব্যস্ত ।
ভরদুপুরে পোহানো রোদ,
বিঘ্ন ঘটাচ্ছে অসময়ের সূর্যাস্ত ।

শীতের সাঝে হিম ঝরার টুপ টুপ শব্দ ,
কনকনে সাঁঝে ক্লাবগুলোতে পড়েছে তালা , হয়েছে বন্ধ ।
শীত করেছে প্রখর গ্রীষ্মের উষ্ণ উত্তাপকে জব্দ ,
ভেসে আসছে সড়কপথের ধার থেকে ভাপা পিঠের ম ম গন্ধ ।

তন্দ্রাহীন রাতের স্তব্ধতা প্রবহমান ,
শীতল বাতাস রাতের নিঝুমতায় আশ্রিত ।
অন্তপ্রবিষ্ট নিঃসঙ্গতা বিরাজমান ,
নিঃসৃত কুয়াশায় আচ্ছন্ন রজনী উচিত ।

ভোরের সূচনায় উদীয়মান মৃদু আলো ,
ঘড়ির কাঁটা আবহমান ।
শীতের আলিঙ্গনে আবিষ্ট সূর্যরশ্মি জোরালো ,
কু-ঝিক-ঝিক রেলগাড়ির শব্দ ভাসমান ।

বিহঙ্গ কলরবে আঁধারের বঞ্চনা ,
সরচিত আনুষঙ্গিক দিবানিশির প্রতিঘাত ।
শীতল অলস দিনের সূচনা ,
উপসংহারে নিস্তব্ধ নিঝুম রাত ।

নাতিদীর্ঘ জীবনের অবশেষটুকু

সোহিতা দে রায়
চতুর্থ সেমিস্টার, পদার্থবিজ্ঞান

নাতিদীর্ঘ জীবনের অবশেষটুকু
সময়ের কাছে গচ্ছিত রেখে,
আমি চলে যাব ;
আমি চলে যাব মহাকালের পরিযায়ী সফরে।
মহাজাগতিক আলোয় বাষ্প-স্নান সমাধা হ'লে ;
নক্ষত্রমন্ডলীর ধুলোয় সেরে নেব প্রসাধন।
মহাবিশ্বের কাছে শিখে নেব আপেক্ষিকতা,
কৃষ্ণগহ্বরের আগ্রাসী মনোবৃত্তি।
জ্যোতিষ্কের অন্ধ অনুগমন দেখতে দেখতে;
কক্ষপথ পরিবর্তনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলে,
আবার বেরিয়ে পড়ব
কোনো এক নতুন আকাশগঙ্গার খোঁজে;
সময়ও যেখানে স্থবির।
ইথারীয় জলপ্রপাতের সন্ধানে ব্যর্থকাম হয়ে,
সহস্র আলোকবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়ে ফিরে আসব আলোকবর্তিকায়।
পরিযান শেষে সরীসৃপের শোণিত মেখে
আমি ঢলে পড়ব গভীর শীতঘুমে...

ফিরে গিয়েছিলাম, ফিরেছিলাম

অহনা সোম
প্রথম সেমেস্টার, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

যেখানে হয়েছিলো প্রথম দেখা
তোমাকে খুজে পেতে আর একবার ছুয়ে দেখতে
কিন্তু তুমি গিয়েছো হারিয়ে
পেরিয়ে গিয়েছো অনন্তের সেই প্রবাহিনী তটে
সেই দোলনা, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছ
লাল বিছানা সাজিয়েছে যার ফুলগুলি
সেই পূর্নিমা চাঁদ-এর আলোয়
নদীর রূপালি জলের ঠান্ডা স্পর্শ-এর
মাঝে তোমায় অনুভব করতে,
তোমাকে আরও একবার খুঁজে পেতে।
ফিরে গিয়েছিলাম সেই খোলা প্রান্তরে,
দিগন্ত বিস্তৃত সেই প্রান্তর,
আকাশভরা তারার সমারোহ
তবে আমি একা,
তুমি ছিলে মা সেখানে চিনিয়ে দিতে অরও একবার
কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমন্ডল।
ফিরে গিয়েছিলাম সেই পাহাড়ি ঝরনার কাছে
নিজের সারা দেহমন সিক্ত করে আরও একবার
পেতে চেয়েছিলাম তোমার হাতের স্পর্শ
আমার শরীরে লেগে থাকা,
প্রতিটি জলবিন্দুর মধ্যে তোমাকে অনুভব করতে
কিছু পাইনি তোমার দীর্ঘশ্বাস অনুভব করতে
আমার ঘাড়ের পাশে।
ফিরে গিয়েছিলাম সদ্য বৃষ্টিভেজা পথে
তোমার ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপ ধরে,
সেই শহরের প্রান্তরে পোড়ো বাড়িটাতে
আমাদের ভালোবাসার প্রতীকরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বাড়ি।
বলতে চেয়েছি তোমায়, ''যেও না,
চেয়ে দেখো, এখনও তো বসন্তে ফোঁটা
সবুজ পাতাগুলি ঝরে যায়নি
তুমি কীভাবে চলে গেলে আমায় ছেড়ে''
সোঁদা মাটির গন্ধে খুজে পেতে চাই,
তোমার গায়ের সেই চেনা গন্ধ
দুরে যেতে চাই তোমার বিস্তৃত বুকে
ফিরে গিয়েছিলাম শহরের মাঝে সেই রাস্তায়
আশেপাশে ছিল জনমানবের সমাগম
তবে সময়টা যেন গিয়েছিলো থেমে
চারিদিকের সেই শুন্য নিস্তব্ধতার মাঝেই হঠাৎ
ভেসে উঠল তোমার রক্তাক্ত সেই দেহ
সেই দেহটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, এসে দাঁড়াল
আমার খুব কাছে
আবার তোমায় পেলাম খুঁজে
তোমার নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের উপর
আমার মাথা তোমার বুকে হৃদয়স্পন্দন,
হৃদয়স্পন্দন শোনার এক ব্যর্থ চেষ্টাতোমার আঙুল আমার চুলে
তোমার শরীরের রক্ত আমাকেও করছে রক্তাক্ত।
তুমি বললে এবার বিদায় নিতে হবে,
আমি শুনলাম, মন বলে উঠল
''কিন্তু তোমার ছাড়া তো আমি অস্তিত্বহীন
এই বিশাল পৃথিবী,
কিন্তু আমার একান্ত আপন বলতে তো একমাত্র,
একমাত্র তুমিই ছিলে''
কিন্তু আমি ছিলাম ভাষাহীন।
হঠাৎ করে আবার তোমার রক্তমাখা দেহ পড়ে রইল রাস্তায়
অতীতের স্মৃতি অনুসরন করে দেখতে পেলাম,
চারপাশে পুলিশ, হাজার লোকের ভিড়
অ্যাম্বুলেন্স, কোলাহল আর তুমি
তোমার শীতল স্থির দৃষ্টি
দূর থেকে ভেসে এল তোমার কণ্ঠস্বর
বিদায়! আজ তবে চলি,
সময় তো ফুরোলো।
শেষবারের মতো চিৎকার করে বলে উঠি
ভালোবাসি তোমায়, খুব ভালোবাসি
চলে যেও না আমায় একা ফেলে।
তবে হারিয়ে গেলে তুমি অন্ধকারে
আমার জীবনের শেষ আলোকবিন্দুটুকু নিয়ে
আরও আমি ফিরে যাই সেই নদীচরে,
খেলা প্রান্তরে, পাহাড়ি ঝরনার কাছে,
ফিরে যাই পোড়ো বাড়িটাতে ঝরাপাতা কুড়োতে
আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী যে তুমিই।।

চেনা অচেনা

শুভরাজ
চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ

চেনা বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হতে হতে
আজ শূন্যে বিলীন..

চেনা মানুষ গুলো অচেনায় মিশে
যেতে যেতে ক্রমশ ক্ষীণ..

সময়ের বেড়াজাল, সেকাল একাল
কালের স্রোতে সব মলিন..

ভাবনার অবকাশ, কারো কাছে নেই আজ
সব ভাবনা যেন অর্থহীন..

কংক্রিট

অনন্যা দাস
প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

কংক্রিটে ভরে গেছে এ শহর
কংক্রিটের অলিগলি,
কংক্রিট জমেছে দেহে
কংক্রিট মাড়িয়ে চলি।

নিশ্চিত ধসে যাবে একদিন,
অবকাশের দেখাতেই,
কংক্রিট গলে যাবে সেই,
ভালোবাসা শেখাতেই।

আমাদের কথা

মেঘা ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

তোমায় একটা ঘটনা সাজাতে বলবো
সূর্যোদয়- একটা নদী - সাঁকো পার করে- সূর্যাস্ত।
তুমি সাঁকো পার করে ফুল পেয়ে
ফেরার পথ ভুলে গেলে ।
ভুলে যাওয়া রোগটা ইদানীং চেপে বসছে শরীর জুড়ে ।
তোমাকে আর মনে পড়ে না ।
চশমা থেকে মানুষ বৃত্ত হয়ে ঘুরতে থাকে
মেলে না জিগ স পাজল ।
গোলাপি উল বুনতে বুনতে খেয়াল হয় শীতকাল শেষ হয়ে গেলো!
এটা তবে তুলে রাখতে হবে ।
বোধহয় বুকে রাশ রাশ বাষ্প জমতে থাকে
সেই আঁচ লেগে চোখ উষ্ণ হয়-
শীতে বড়ো কষ্ট -
উষ্ণতা সব জমা রাখা প্রয়োজন ।

অসুখ

পূজা নন্দী
অধ্যাপিকা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

১.যে জ্বরের বাড়বাড়ন্ত শরীর জুড়ে
মাথার কাছে আলতো তার শিহরণ
শিরা উপশিরা বরাবর টান
পারত পক্ষে জ্বালা ধরা চোখ নিয়ে
আজানের শব্দে ঘোর ভাঙে
ঘুম পায়, ঘুম পায় আমাদের দীর্ঘ
এক অভিমানের ক্লান্তি পেরিয়ে
এই আলস্য তোমার কপাল ছোঁয়
মাঝেসাঝে জ্বর এত ভালোলাগে...

২.এই ব্যক্তিগতের আবেশটুকু পেরিয়ে
জ্বর এক বাহানা মাত্র
ভুলে যাওয়া কথোপোকথনের
অনেকটা পথ মারিয়ে
যেখানে নদী কখনো শান্ত হয়
কখনো তার অস্তিত্বও ভুলে যায়

৩.যতক্ষণ জ্বর লেগে থাকে
ততক্ষণই সুখ
পারদের ওঠানামা
আমাকে তোমার মতন
রাশভারী করে রাখে
লগি হাতে এই পিছল, বড় মোহময়
আমি জ্বর ভালোবাসি
এই দিধাতুর ছোঁয়াও

৪.চেনা জ্বরটুকু ঘুরে ফিরে আসে বারবার
দেওয়ালের এক প্রান্তে
সজীব লেগে থাকলে বুঝি
কেন এই শ্বাসাঘাত
গাছেদের কথার এত উষ্ণতা
আমাকে শীতল থেকে শীতলতর করে
একরাশ কাপুনি দিয়ে
সকাল পেরোতে দেখি

৫.শিরদাঁড়া জুড়ে টান জন্মালে
মনে হয় যেন কোনো আদিম জন্ম
আমার চেতনার দীর্ঘতা মাপে
শব্দের পর শব্দ জড়িয়ে...

কল্পনা

রিপন ঘোষ
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

এখানে সবটাই কল্পনা,
কখনও সে মায়াভরা...
কখনও বা নিদারুণ,
ভীষণ অসুখে অবচেতন মনের কল্পনা।
সুষুপ্তির ঘুমে তোমায় ছুঁয়ে থাকার শান্তি,
সবকিছু তালগোল পাকিয়ে
অকারণে এপাশ ওপাশ ছটফট করা।
ঘুমহীন জ্বালাভরা চোখে তবুও স্বপ্নদেখা।
পাবে না তাঁকে তবুও শান্তি অপার তার চিন্তায়
চোখ ফেটে পড়বে জল.....
পরক্ষনেই ঠোঁটের পাশে পাগলের হাঁসি।
চোখ মুছে নিজেকে শক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস,
ঘড়ির কাঁটার শব্দে বেঁচে থাকার নি:শ্বাস।
একা রয়েছো তুমি, সত্যি কি একা!
বুকের বাপাশে ফিস্ ফিস্ শব্দ
কল্পনা, মায়াভরা কল্পনা।
সবটাই কি শুধু কল্পনা!

আমি দুলি হাঁসদা

শিবশঙ্কর চৌধুরী
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

বাবু আমি দুলি হাঁসদা — থাকি মাটের ধারে।
যদি চাস আসতে আমার বাড়ি
আয় তবে হিঁদুর গিরাম পেরিয়ে,
মুচলমানের গিরাম দিয়ে, সুজা মাটের পারে।
ইটাই আমার ঘর।
ছেলেমেয়ে করল খানি পড়াশুনা,
দেকি কোন কাজে ওদের মন লাগেনা।
না যায় ওরা মাটে,
না যায় বাইরে কোন কাজে।
মাটে আমি কাজ করেচি,
নদীতে ধরেছি মাচ,
গাছের সাথে কথা কয়েচি,
পিরানে আমার লেগেচে বাতাস।
এখন আমার কিছুই লাগে না ভালো,
ঘরে বসেই কাটাই সময়।
আমার বাড়ির রাস্তা গেচে মাটের পানে,
আর গেচে মস্ত গিরামে।
গিরামে যেতে চায়না মন,
না পারি যেতে ছুটে মাটে।
ঘরের কোনে থাকি বসে
মনের সাতে কই কতা।
মন জিগায় আমায়—
'দুলি তুই কি পেলি?'

জলের শহর জলপাইগুড়ি

মৈনাক বর্মন
ষষ্ঠ সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ

জল যেন তুমি শহরের বেশে হ্যাঁ, তুমি তুমিই জলশহর

তাই তুমিই তো দেখেছিলে এক গ্রামকে শহরে পরিণত হতে,

তুমিই দেখেছিলে মানুষের আবেগকে কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে।

তুমিই শুনেছিলে মাঝির গান নৌকায় আর খেয়ায়
তুমিই দেখেছিলে সূর্যাস্ত সিগারেটের ধোঁয়ায়।

তুমিই তো ছিলে সাক্ষী যেদিন শেষ হলো রাজার শাসন,

তুমিই এখন দেখছো নীরবে রাজার ভগ্ন আবাসন।

তুমিই তো দেখেছিলে সেই শিশুর ক্ষুধার্ত চোখের চাহনি,

আর তুমিই তো শুনেছিলে সেই বৃদ্ধার মুখে তার মনগড়া কাহিনি।

তুমিই দেখেছিলে শীতের সকালে গাছের সদ্য ফোঁটা কুঁড়ি,

করলার বাষ্পমাখা ছোয়া মেখে তুমিই জলের শহরজলপাইগুড়ি।

পুরোনো চিঠি

জয়ন্ত ভক্ত
ষষ্ঠ সেমেস্টার , ইংরেজি বিভাগ

পড়ে আছে বোধ করি কোন্
এক তাকের অন্তরালে
পুরোনো চিঠি নাকি আমি
অলক্ষিত চিঠির ছলে!
ধুলো জমেছে তবে —
জমবার বাকি
এখনো অনেক
ভার সে তো বেড়ে চলেছে
ধুলোর প্রতি পরতে।।
স্মৃতিগুলো সব হচ্ছে ঝাপসা যত
ধুলোর আড়ালে।

Pain paints paintings

Akash Barat
Fourth semester, English Department

They tell me
Your paradigm of paradise is paradoxical
You've paralysed the puzzles of your pain
And this pain now paints paintings for you
Paintings of your lonesome life,
A life that you lend people to scrutinize
And in return they provide you with flaws,
Flaws, regardless of how you feel.
Now you think you're way too naive
Everything you deal in seems convoluted
Every friend seems to be a fiend
No happy song would delight you anymore
As you find the harmonies frenjied
And the violence of violins inevitable
You cry out,...
Play me a mazy, murmured mournful song.
As your pain paints paintings.

Song of Inevitable

Debaditya Chakraborty
Fourth Semester, English Department

Born From The Dome Of Life...
Oblivious To The Fact We Have To Strive...
Hibernating All These Frozen Years...
Now We're Just Left With Illusory Fears...
Mummifying Our Treasured Dreams...
No One's Gonna Hear Even If It Screams...
In Due Course We Find Tranquillity In a Dark Room...
Cause It's The Hour For The Night Queen To Bloom...
Gawking At The Ceiling Won't Avoid A Nightmare...
Cramming The Dead Leaves Won't Lead Them Anywhere...
The Grin Won't Hide The Soreness Of The Floody Eyes...
The Briny Bed Tells The Anecdote Of The Fallacious Lies...
We May Fall For Someone And They Might Too...
They've Their Priorities It Might Not Be You...
No Matter How Much We Want Them To Stay...
No He Won't Respond Even Though We Pray...
They'll All Fade For A Drop Of Rain...
No It's Not Time It's The End That Will Dwindle The Pain...

Mask

Snigdhajyoti Roy
Fourth semester, English Department

There lies a man,
A blanket softly loving his warmth
the gloomy light reveals something on his face, a mask
He's been wearing those for so long,
that no-one remembers what he looked like
A new day, a new mask
On his birthdays, he used to wear a mask of overwhelming joy with a shade of despair
First time he got his heart broken, he took up a mask of toughness
The day his job was confirmed, a mask of relief, he wore
A mask of revolt, as there was a huge deduction in his salary
He fell in love, once again, a mask of completeness, for the first time
After his mother's death, he attended funerals with a mask of consolation which felt quite depressing
All his life, these masks kept him alive
Tonight the mask fell off, maybe the blanket won't be able to keep him warm for too long
We can see his real face now, a face of insanity, a face that has devoured his soul, a face that has turned blue already, a face that no-one knew ever existed

The silent sorrow

Nikita Ghosh
Sixth Semester, English Department

Voices, voices, voices
I hear,
The pangs of laughter,
The agony of joy,
The scars of ridicule,
The anguish of being coy;

Noises, Noises, Noises
Of distress,
Why the unreal seams to be clear?
The empty,damp room that tries to avoid the disaster complains,
"why melodies always have to turn into screams ?"
Why such instruments, when we are not allowed to sing?

The walls remain muted as it knows not any answer,
The universe appears to be a myth as all hopes disappear!

Wanderer of the Dark

Susmita Barman
Sixth Semester, English Department

Of myself and my reeking soul I think
And of the satyr that inside of me lives.

I have been in the dark lately
I have always been in the dark
Like a living corpse, I wander
In the darkness of the dreary night.

The memories walk the streets beside me
Like shades one cannot touch
They covet my holy laughs,
Knit my fate,
I suffer
I breathe guilt
I live with a face of a sinner.

ছড়া

শীতের সম্বল

প্রীতম মজুমদার
প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

পৌষ মাঘ মাস
শীতের বড় হ্রাস
সূর্য নাকি নিরাশ
বৃদ্ধ হল উদাস
পথের দু ধার
অনাথের হাহাকার।
নেই তো ওদের আজ
একটিও কম্বল
তাই বলি হবে নাকি
তুমি ওদের সম্বল?
দিবে নাকি তাদের
গায়ে জড়িয়ে কম্বল।
হয়ে দেখো তুমিও তাদেব সম্বল
জিতিয়া দেখো আজ অসহায়ের অন্তর
বাঁচিয়া রহিবে তুমি যুগ- যুগান্তর ।

কলেজের প্রথম দিন

রিয়া খাতুন
প্রথম সেমেস্টার, জীববিদ্যা বিভাগ

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে আসি যবে কলেজে,
ঢোকে না নিয়ম কানুন মাথা আর মগজে।
এ,কেমন প্রতিষ্ঠান,চারিদিক ছোটাছুট স্থির নয় কেহ।
হাজারো নজরের ভিড়ে যেন হারিয়েছি নিজেরে।
ইউনি ফর্মের নাম নেই,চারিদিকে পোশাকের বাহার,
এতগুলো ক্লাসরুম,জানি নে কোনটা কাহার।
ক্লাস খুঁজে পাই না,উপর-নীচ ছোটাছুট।
কাহাকে করিবো জিজ্ঞাস,মানুষ সব অদ্ভুত।
সাহস করিয়া,জিজ্ঞাসা করিয়া
জানিলাম তাহারো একই দশা।
ছাত্র শিক্ষক,পার্থক্য না পাইয়া
ছাত্রকে শিক্ষক আর শিক্ষককে ছাত্র বানাইয়া একাকার।
অবশেষে, ক্লাসরুম খুঁজে,যাবো যখন ঢুকিতে,
হঠাৎ দেখি দরজাটা আটকানো।
মনে মনে ভাবি ,এ ক্লাস তবে অন্য কাহারো।
ঘোরাঘুরি করিয়া ,আসি যখন ফিরিয়া,
জানিলাম ,এ ক্লাস আমারই।
সরল মনে প্রশ্ন জাগে, ক্লাস হয় তবে দরজা আটকাইয়া?
প্রথমদিন কলেজ আসিয়া নাজেহাল অবস্থা,
বাকি দিন তো আছে এখনো পরিয়া।
ভয় হয়,শেষে বিপাকে পড়িয়া যাবো না তো মরিয়া!

অকাল বিসর্জন

প্রসেনজিৎ ঘোষ
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

ঘাটে জন মানবের হইচই! আকাশটা মেঘলা, যেন বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আকাশটা থমকে গেছে। আজ যে উমা পিত্রালয় ছেড়ে শ্বশুরালয়ে যাবে। চারিদিকে মাইক বাজছে, বাজনা-বোম একেবারে গমগমে পরিবেশ। ঘাটে রয়েছে একটি মাত্র দুর্গা প্রতিমা। তাকেও শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। সাত পাক ঘুরিয়ে তাকে রাখা হয়েছে ঘাটের পশ্চিম প্রান্তে। হঠাৎ সবাই দেখে দূরে একগুচ্ছ লোকের মধ্যে একটি লোক মাথায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আসছে। লোকটি কাছে আসতেই সকলে বুঝতে পারলো, এ সদ্য মৃত তরুণ সেই ছেলেটার ভাতসড়া নিয়ে তার আত্মীয় আসছে সজল চোখে। অদ্ভুত ভাবে লোকটি ঘাটে নামলো। মা দুর্গাও ঘাটে নামলো। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। লোকটি ভাতসড়া জলে বিসর্জন দিলো। মা দুর্গারও বিসর্জন হলো। চলে গেলো, চলে গেলো...।

কুমার গ্রামের ইতিবৃত্তান্ত

মেহেবুব আলম
প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

মতিকান্ত লেনের পাশে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর ছায়ানিবিড় একটি গ্রাম। গ্রামের নামটি কুমার ঘাট। পাশ দিয়ে চলে গেছে একটি শুষ্ক নদী। অতীতে নদীর জলে বন্যা হত, তবে বর্তমানে প্রায় মজে গেছে। এখানে বসবাস করে সহজ-সরল মনের মানুষেরা। বাইরে থেকে আগত বড় লোকেরা এদের নাম দিয়েছেন গুরুং। এবারে আমরা জানবো গুরুংদের ইতিহাস। তারা যখন বাসবাস করত গ্রামে ছিল না বিদ্যুত, রাত্রি হলেই গভীর অন্ধকার। তখন ছিল না মোটরযান, বড় বড় ইমারত, কারখানা ইত্যাদি। তবে মানুষের মনে ছিল শান্তি, চোখ বন্ধ করলেই শোনা যেত পাখিদের কলরব, ময়ূরের ডাক। দূর থেকে ভেসে আসে বিভিন্ন রকম পুষ্পের সুগন্ধ, যা মানুষের মনকে উতলা করে তুলত। বর্ষাকালে বৃষ্টিকালে বৃষ্টি হলেই গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাসের এক আলাদাই রূপ পরিলক্ষিত হত মাঠে। চাষীরা চষা মাটির গন্ধে নিজেকে হারিয়ে ফেলত।

আর একটা মজার বিষয় হল গ্রামের ভিতরে একটি জঙ্গলে প্রত্যেক সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট বসত। তবে এই হাটের নতুনত্ব সকল মানুষকে আকৃষ্ট করত। তাই দূর থেকে বহু মানুষ আসত শুধু বাজারের উদ্দেশ্যে । নতুনত্ব হল এটাই যে, গুরুংরা নিজেদের ফলানো ফসল যেমন-আলু, পালং, ফুলকপি, লঙ্কা, টমাটো, গাজর, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি বিক্রি করত। কথিত ‘‘প্রাচীন কাল থেকেই তারা এই ফসলগুলিতে কোন কীটনাশক ব্যবহার করত না, শুধু গোবর সার দিয়ে সবকিছু উৎপাদন করত, যা তাদের ঐতিহ্য’’। আর এই হাটে পাওযা যেত তাদের হাতে বানানো নানা রকম সৌখিন জিনিস, যেমন- মাদুর, চেয়ার, আয়না, রান্নার আসবাবপত্র ইত্যাদি। যার কারুকার্য সকল মানুষের মন জয় করে নিত।

কলের নিয়মে তাদের পরিবেশে ও তাঁরাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো অবস্থা নেই, তাঁদের জীবনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এখন চোখ বন্ধ করলে আর শান্তি পাওয়া যায় না, গড়ে উঠেছে বড় বড় দালান, কারখানা। কানের মধ্যে ভেসে আসে কারখানার ঘর-ঘর শব্দ, মোটারযানের ভোঁ-ভোঁ শব্দ, নেই আর পাখিদের মধুর আওয়াজ। মানুষের সমাগমে ওই হাট আজ নগরে রূপান্তরিত। উপদ্রব হয়েছে অসাধু- জোচ্চোর মানুষদের, যারা সরল-সাধাসিধে গুরুংদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে । তারা এখন নির্যাতিত, অপমানিত, শোষিত তবুও তারা সেই সনাতনকে আঁকড়ে বেঁচে রয়েছে। তাদের মনে প্রতিবাদ থাকলেও প্রতিবাদের ভাষা নেই। তাঁদের কলমে কালি থাকলেও লেখার শক্তি নেই কারন তাঁরা নিরূপায়, নিরিহ, তাঁদের পাশে কেউ নেই , তবে তাঁরা এই আশায় প্রহর গুনছে হয়তো কোনোদিন তাঁদের প্রতি শিক্ষিত সমাজের চোখ পরবে, তাঁরা সবকিছু ফিরে পাবে আবার আগের মতো

মন্দার

সুয্যদীপ্তা সরকার
চতুর্থ সেমিস্টার,
বাংলা বিভাগ

দুঃখ ঘুচবে ক্যামনে?কত কইরা বলছি,ওই অলুক্কুনে মান্দার গাছটারে কাইটা ফেলাও।এই সংসারে এই লক্কীর কথা কে আর কবে শুনছে!নাও,এহন ঠ্যালা সামাল দাও।',গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় লক্ষ্মী।

আর পাঁচজন চাষির ঘরের মতোই লক্ষ্মী-সুজনের সংসারেও নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।তাদের জীবনে শহরের পাঁচতারা হোটেলের দামি দামি খাবারের মন-মাতানো গন্ধ নেই,আছে শুধু মাসে একটা দিন পাতে গরম ভাতের ধোঁয়া,পাশে একটুকরো মাছ,সাথে একরাশ তৃপ্তি।আজ সকাল থেকে লক্ষ্মী সেই তৃপ্তির আশাতেই প্রহর গুনছিল।কারণ সুজন গিয়েছিল আলু বেচতে।এবারে ফলন হয়েছিল বেশ ভালো,তাই লাভের মুখ দেখার প্রবল বাসনাও ছিল।কিন্তু এই বাজার ব্যবস্থা এক অদ্ভুত জিনিস বটে,কখনো আগুন লাগায় শহরের বাবুদের মানিব্যাগে,আবার কখনো আগুন জ্বালায় চাষির ভুখা পেটে,আর একদল শুধু মুনাফা লোটে। শূন্য বাজারের থলি হাতে সুজনকে ঘরে ফিরতে দেখেই লক্ষ্মী যা বোঝার বুঝে যায়। লক্ষ্মীর সুখের আশা-প্রত্যাশাগুলি ভেঙেচুরে পড়ে ভাঙা গাছের শাখা-প্রশাখার মতো,আর তার জন্যে সরল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মন উঠোনের এককোণে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দার গাছটিকে অপরাধী ঠাউরে বসে।

সব বিষয়ে গাছটার উপর এভাবে দোষারোপ করা সুজন মেনে নিতে পারেনা।ক্লান্তি মেশানো বিরক্ত কণ্ঠে চেঁচাতে থাকে,'মান্দার গাছটা তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিছে,শুনি!আইজ ভাগ্যে ছিলনা,তাই আড়তদারের কাছ থিকা দাম পাইনাই। তা বইলা....'

কথা শেষ করার সুযোগ পায়না সুজন,তার আগেই লক্ষ্মী ঝাঁঝিয়ে ওঠে,'ওই ভাগ্যের রাস্তাই তো বন্ধ কইরা রাখছে গাছটা।' কোন্ এককালে মা-ঠাকুমার মুখে শুনেছিল লক্ষ্মী,বাড়িতে মন্দার গাছ রাখতে নেই,দুর্ভাগ্য নেমে আসে মাথার উপর।আর শুধু কি শুনেছিল!-এখন স্বচক্ষে দেখতেও পাচ্ছে যে!সংসারে অর্থাভাব কাটতে চায়না কিছুতেই।মন্দারের শিকড়গুলি মাটির নীচ দিয়ে যেন সুড়ঙ্গপথে আততায়ীর মতো ঘিরে ধরেছে ওদের ছোট্ট ঘরটিকে,ঘরের দেওয়ালে-মেঝেতে ধরিয়েছে ফাটল।কিছুদিন আগেও ফাল্গুনে,চৈত্রে মন্দার ফুলগুলি যখন টুপটুপ করে ঝরে পড়ে ঘরের চালে,লক্ষ্মী ভয় পেত দেখে,ওর মনে হত কে যেন লাল আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওদের কুটিরটায়,সব বুঝি জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে।কিন্তু একথা সে কীভাবে বোঝাবে সুজনকে?

সুজন অসহায় অথচ নিষ্ঠুর গলায় বলতে থাকে,'ভাগ্যের পথ তো বন্ধ কইরা রাখছ তুমি।রাইত-দিন খ্যাকখ্যাক কইরতে থাক,এমন অশান্তির সংসারে ভাগ্য আসবে ক্যামনে?এমন ঘরে অলক্কীর বাস হয়,অলক্কীর বাস।
লক্ষ্মীর রাগ এবার সপ্তমে গিয়ে ঠেকে,'কী কইলা তুমি?'
সুজনও আজ থামার পাত্র নয়,'ক্যান!ঠিকই তো কইছি।তোমার বাপ-মা বাঁইচা থাকলে জিগাইতাম যে,কুন আনন্দে তোমার নাম 'লক্কী' রাখছিল!'

এতক্ষণ রান্নাঘরের ভিতর থেকেই উত্তর দিচ্ছিল লক্ষ্মী,এবার তেল-হলুদের দাগে মলিন আঁচলটা কোমরে গুঁজে বাইরে বেরিয়ে এল সে।দারিদ্র্য যে সংসারের ভূষণ,সেই সংসারে এমন ঝগড়া-ঝাঁটিও চিরদিনের সঙ্গী।এর আগেও বহুবার সুজনের সাথে তার বাগ-বিতণ্ডা চলেছে,কিন্তু এমন কথা সুজনের মুখে এর আগে সে কখনো শোনেনি।এতবছর ধরে মোটাচালের ভাত খেয়ে,মোটা কাপড় পড়ে সুখে-দুঃখে প্রাণপাত করে সংসার ঠেলছে লক্ষ্মী।কী করতে বাকি রেখেছে সে এই সংসারের জন্য! অথচ আজ সামান্য একটা গাছের জন্যে সুজন তাকে 'অলক্ষ্মী' বলল! মন্দার গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্যের রশ্মি,তা দেখে লক্ষ্মীর যেন মনে হল,মন্দারটা বুঝি মিটিমিটি হাসছে,ঝলমলে রোদমাখা হাসি।সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল তার। কান্না ধরা গলায় একইসাথে উঠে এল অভিমান,অভিযোগ,ক্ষোভ,যন্ত্রনা,রাগ, 'আজ হয় এই অলুক্কুনে মান্দারটা থাকবে,নয় এই অলক্কী লক্কী থাকবে।',এই বলে দাওয়ার কোণে পড়ে থাকা দা নিয়েই লক্ষ্মী ছুটে যায় গাছটার দিকে,কিন্তু সুজন এসে হাত চেপে ধরে।
অমানুষিক রাগে ফেটে পড়ে সুজন,'তুমি জাননা!মান্দারটা মোর ব্যাটা হয়?যেইদিন আমাগো নয়ন জন্মাল,সেই দিনই উঠানের মাটি ফুঁইড়া মান্দারের চারা উঠছিল।সেই থেইকা মোর ব্যাটা নয়নের সঙ্গে মান্দারের কুনো ভেদ করিনাই। মোর ছেলেটারে যেমন কইরা আগলাইয়া রাখছি,গাছটারেও তেমনি আগলাইয়া রাখছি সক্কলের কুনজর থেইকা।মোর সামনে তুমি মোর সেই ব্যাটারেই মারবা?তোমার সাহস তো কম না!'

লক্ষ্মী চোখে অন্ধকার দেখে।সুজনের চোখে এমন পাশবিক ক্রোধ সে আর কখনো দেখেনি।সুজনের চোখদুটিও যেন মন্দার ফুলের মতোই টকটকে লাল।সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেয় লক্ষ্মী,দা ছুঁড়ে মারে কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে।অতঃপর রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে সপাটে দরজা দেয় বন্ধ করে।কোথাও কি পুড়ছে কিছু!,ও হ্যাঁ,বোধহয় রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে পোড়া ভাতের গন্ধ।

দিন শেষে রাত হয়। লক্ষ্মী তখনও খোলেনি রান্নাঘরের দরজা। 'খিদা পাইছে,মা ভাত দিবে না,বাবা?',বলতে বলতে কখন যেন খিদেয় কাতর বারো বছরের বালক নয়ন ঘুমিয়ে পড়ে বাবার পাশে।নিকষ অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নিরাপরাধ মন্দার,হয়তো সঙ্কোচ গ্রাস করেছে তাকে।গভীর রাতে ঝড় আসে।একেই বসন্ত শেষে মন্দার এখন রিক্ত,অর্ধমৃত।এতো ঝড়-জলে মন্দার বাঁচতে পারবে তো?মন্দার হয়তো মনে মনে ভাবে,পরদিন সকাল অবধি যদি সে টিকে থাকতে না পারে,কেমন করে কাঁদবে সুজন সন্তানশোকে?নয়নও তো কাঁদবে খুব,তাদের কান্নাভেজা মুখের কথা মনে করে হয়তো কষ্ট পায় মন্দার। আবার পরমুহূর্তে মনে হয়,ভালোই হবে।সে না বাঁচলে লক্ষী নিশ্চয়ই শান্তি পাবে অনেকটা।হঠাৎই মন্দারের আনমনা চিন্তায় ছেদ পড়ে।হঠাৎই তার গায়ে এসে লাগে বাতাসের প্রবল ধাক্কা,নিজেকে সামলাতে পারে না মন্দার।

অবশেষে থেমে যায় ঝড়।রাত্রিশেষে সকাল হলে প্রতিদিনের মতোই ক্ষেতের কাজে বেরোচ্ছিল সুজন।ঘরের বাইরে এসে দেখল,সারা উঠোনময় মন্দারের ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে।কিছুদিন আগে পর্যন্তও মন্দার ফুলগুলো যেন উঠোনে বিছিয়ে দিত লাল গালিচা।এমন ভালোবাসা-রঙা লাল মন্দার ফুলগুলি সুজনের ভীষণ প্রিয়,আজ সেই লালিমার অভাব বোধ করে সুজন।হঠাৎই একটা বিষয় সুজনকে ভাবিয়ে তোলে;রান্নাঘরের উপরের মোটা ডালগুলো নেই কেন?রান্নাঘরের চালে কী সুন্দর ফুল ঝরাত ডালগুলো!ঝড়ে ভেঙে পড়ল নাকি?,আহা!মন্দারের ব্যথাটুকু সুজন অনুভব করে মনের গহীনে।

কিন্তু,এ কী!এতক্ষণ সুজনের মাথাতেই আসেনি!রান্নাঘরের চালও তো ভাঙা,গাছের ডাল পড়ে দেওয়ালের কিছু অংশও ভেঙে পড়েছে।দুর্ঘটনার আঁচ পায় সুজন।রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে, 'লক্ষ্মী,লক্ষ্মী',সাড়া নেই।তবে কি!না,আর ভাবতে পারেনা সুজন।ধাক্কা মারে দরজায়,নড়বড়ে কাঠের দরজা খুব সহজেই খুলে যায়।নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনা সুজন।অথচ অবিশ্বাস করার মতোও তো কিছু নেই,গাছের ডাল,ঘরের চাল,খসে পড়া দেওয়ালের চাপা পড়ে নিশ্চিন্ত মুখে যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে লক্ষীর দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অচৈতন্য শরীর,নিঃসাড়,ঝরে পড়া পাতার মতো কেমন যেন ফ্যাকাসে।

সুজন কেন যেন বুঝতে পারেনা কিছু।হঠাৎই বাস্তবজ্ঞানশূণ্য হয়ে একটা কুড়ুল নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় নির্দোষ মন্দার গাছটার কাছে।ভুখা শরীরে যতটুকু জোর আছে,সবটুকু একত্র করে কোপ মারে মন্দারের গায়ে।চেঁচিয়ে বলে, 'মোর বাড়ির লক্ষীরে মাইরা ফেললি তুই!ব্যাটা বইলা আর মাফ করব না,আজ মাইরাই ফেলব তোরে।' হৃদয়ের জ্বালায় মারণ-কোপ মারার আগে অজান্তেই চোখ বুজে ফেলে সুজন,কী জানি কেন!হয়তো স্ত্রীকে হারিয়েও অন্তরের অন্তঃস্থলে মন্দারের উপর থেকে মায়া সরেনি তার।সন্তানসম মন্দারের মৃত্যু তার দু-চোখ সহ্য করতে পারবে না বলেই হয়তো আঘাত হানার আগে আপনিই চোখ বুজে এসেছিল তার।চোখ বুজেই বারকয়েক আঘাত হানে মন্দারের গায়ে।

এবার সে চোখ খোলে।চোখের সামনে দেখতে পায় দুটি সন্তানের মৃতদেহ।হ্যাঁ,একটি নয়,দুটি লাশ।একদিকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে নির্বাক মন্দার,আর অপরদিকে ধুলায় মিশে আছে সুজনের বারো বছরের সন্তান নয়নের রক্তমাখা নিষ্প্রাণ দেহ।

কখন যে প্রিয় গাছটাকে বাবার উদ্ধত কুড়ুলের হাত থেকে বাঁচাতে নয়ন এসে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাছের সামনে,সুজনের অন্ধ রাগ তা দেখেইনি।হয়তো 'বাবা,মেরোনা।মন্দারকে মেরোনা।' বলে চেঁচিয়েও উঠেছিল নয়ন,কিন্তু যন্ত্রবৎ পাগলপ্রায় সুজনের বদ্ধ কান তা শোনেইনি।নিদারুণ আঘাতে কখন যে একইসাথে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সুজনের হাতেই মরে গেছে সুজনের দুই সন্তান;মন্দার আর সুজন-লক্ষ্মীর নয়নমণি নয়ন,সুজনের কুড়ুলধরা হাত তা টেরই পায়নি।

বসন্তে যেখানে রাশি রাশি লাল টুকটুকে মন্দার ফুলেরা গড়াগড়ি খেত,সেখানে সুজন দেখে নয়নের লাশ থেকে গড়ানো লাল তাজা রক্ত।কিছুক্ষণ আগেই লালিমার অভাব বোধ করছিল সুজন,কিন্তু সন্তানহন্তা সুজন এখন বুঝতে পারেনা,চোখের সামনে এই এতো লাল,এ কীসের রঙ?,ভালোবাসার,নাকি খুনের?

MIRROR

Asima Sarker
Asst. Professor, Department of English

She lay in the bed wide awake and looked at the stout body that lay beside. It was a night of remembrance and conflicts. Her dishevelled clothes concealed the dissatisfaction and narrated the story of a wild pleasure. She thought how words can crumble the palace of illusory happiness. He slept like a man who had not slept in years…like a child, contented; but she was moving back in time. She remembered a similar night when the face lying beside her made her nauseous. It was the same innocent black face that once had made her vouch love .It was the time before their families had agreed to their marriage. Things change and that was the only inevitable truth.

Their marriage did not last: the marriage of the black man and the fair lady. Love is philanthropic and hormonal; marriage selfish and practical. Initially she tried, in spite of the revolution in mind, body and soul that shattered her ideals from within. From lovey dovey words, dressing to impress, to cooking surprise dinners, she did it all; and in wintry nights like this she tried hard to balm her injured grey cells; she tried to be amnesic of the sly smiles of her colleagues seeing her walk with her husband; she tried not to recollect her parents' and relatives' comments: “I heard the tribal people have weird rituals”….. “You both look like black and white tv”…”You could have got a better lad.” There were also a sympathetic lot of people: “Don't think about his colour. He is a man of golden heart”; and then there were the far-sighted optimistic ones: “Your children will have a certificate to secure their future. You are smart.” She loved him. He loved her. Their marriage failed. She was nauseous. He was guilty. In nights like this she had cried not because she lacked love, but because she failed. She was in love and then not in love at the same time. There was something lurking within like a wild beast in deep forest. She dreamt every night, that she was made of mud and straw and was floating in a river.

Her divorce came as the much awaited news. Relatives sighed in relief. Colleagues were happy with the new topic of gossip. She was haunted by those forgiving eyes and his last words before she moved into this new city: 'I know you loved me and will always love me.'

She sought transfer for she wanted to escape and be amnesic of her past. She joined yoga classes in the morning, did overtime and came home at about 11 every night. That was the time of the day or more precisely night, when her body gave up and she sank into the soft mattress. She was too tired to even dream. Her weekends were spent sleeping, eating and partying until the day when she felt dizzy and visited a doctor's clinic nearby. Her parents came to her new flat with a new problem that needed immediate sorting and of course a remedy. Within a month she moved into her new home. Ravi was a tall, fair and liberal chap who made life easy for her. He tried quaffing away all her pains. After many months her social media profile showed her smiling face. She was no longer a gossip, but an object of envy.

Within a month she returned to her normal life and demeanour, just that she piled all mirrors in a store room. She was beautiful and the lack of mirror in her dressing room didn't affect her appearance. Ravi was unaffected initially. He liked following her whims. He was concerned only when she lost her consciousness seeing her own reflection in the patterned glass of shopping mall. Those were the days of doctors ,tantrics , ojhas. Nothing seemed to help. Everyone waited for a miracle, and the miracle happened.

The child was born on a rainy day. Sahaj, easy….miracles always make life a rainbow. Hercatoptrophobia vanished into the thin air.

She was busy taking care of the child. He was her world. She felt that the baby had made a rebirth possible. The world only envied her expensive gifts, tours and display of affection. They made a happy couple. She was grateful to Ravi and faked to please. Ravi took it as love.

Today was her child's 12th birthday. She was happy. Ravi was happy and had made nice arrangements. The guests argued furtively, but Sahaj was very happy…balloons, cakes, gifts, flowers, games, friends. Mom had tried every year, but Dad was too busy; but today the wait for years was over and it happened…a grand birthday, a happy mom, a happy dad and a happy kid. The night before she had dreamt of standing by the side of a river watching sunset…she could feel the flesh of her face. Ravi murmured as he stood with a glass half-full, “The wait was over”, and the paper rolled into a ball fell into the dustbin centripetally.

Sahaj was happy, everyone said…mom, dad, guests, didun, dadai, and his friends, all wheatish and fair….He was happy; he saw his mom happy like never before. Just before he went to sleep, he had rounded his hands around his mamma's waist…there were things that mattered more than gifts, balloons, cakes and skin colours…Sahaj knew about whispers…guilt, shame, skin colour, a newspaper cutting, a dead man, but he felt a strong impulse, a warm, loving rhythmic air in the ears and his lips moved involuntarily and whispered into her ears:'I know you loved me and will always love me.' The boy had the same forgiving eyes and an innocent face….just that in his eyes broken bits were joining into a fair skinned face…or was it crumbling like never before!!She lay in the bed wide awake and looked at the stout body, fair complexioned, that lay beside…..

এক যে আছে এসি কলেজ

কৃষ্ণ রায়
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

অনেক ভেবে দেখেছি, এসি কলেজ নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি অবশ্যই সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারব না। ভুল থেকেই যাবে। সব বলা হবে না বা যা বলতে চাই, সেটুকুও বলে উঠতে পারব না। তবুও, যতক্ষণ আমার স্মৃতিঘর আমাকে কথা জোগান দেবে ততটকুই হবে আমার অর্ঘ্য।

কখনও যদি আপনি জলপাইগুড়িতে আসেন একটিবার আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে এসে ঘুরে যাবেন। ওইটিই হল জলপাইগুড়ির ইতিহাসে সবচেয়ে অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। জীবনে অনেককিছু আমরা পাই না। আমিও পাব না, জানি। কিন্তু যা পেয়েছি সে কথা আজ বললে তেমন ক্ষতি নেই। আমার সুযোগ হয়েছে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক পড়ার। অবশ্য আমার নিজের ওপরেও দৃঢ় ভরসা ছিল, এটাই হবে আমার মহাবিদ্যালয়। একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনও করিনি।

যতদিন বিদ্যালয়ের চার দেয়ালে থাকা যায়, ততদিন শিক্ষার্থীর মনের ভেতর কেবল পৃথিবী একটা আশ্চর্য জগত হিসেবেই থেকে যায়। চিন্তা কম থাকে। ততদিন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে কাটিয়ে দিতে হয় ছাত্রদের। আমাদের ভাঙতে হবে নিজেদেরকে, জীবনে কখনও আর কিছু না থাক অন্তত আমার সঙ্গে আমার শিক্ষা, বোধ, রুচির বিকাশ ঘটে চলুক এটুকু চাই। আমাদের বিদ্যালয় জীবন শেষ হল! শেষ হল কিন্তু সব শেষই শেষ নয়। শেষের পরে একটা নতুনের যে শুরু হয় সে আনন্দই তো আমাদের ভরসা দেবে আগামীর পথে। আমরা আরও একটু বড় হতে শুরু করলাম। নাকের নিচে লোমের রেখা স্পষ্ট হতে শুরু করল। আমরা কলেজে ভর্তির জন্য অ্যাপ্লাই করলাম। এবং আমরা কলেজ ভর্তি হলাম।*

প্রথমদিন সাতই জুলাই, দুই শূন্য এক আট। তিনতলা। সেমিনার হলে আমাদের সঙ্গে কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের অচেনা ঝাপসা আলাপ হল। আমরা নিচে নামলাম। আঠাশ নম্বর রুম। আহা! আমাদের সেই আঠাশ নম্বর রুম। আজও কলেজে গেলে ওই রুমটার সামনে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি, ক্ষ্মএটা আমাদের রুম।ক্ষ্ম

পরের মাস। বাইশে শ্রাবণ। কে জানত আমাদের এই ব্যাচটা একটু বেয়াড়া ধরনের! কিছু না জেনে বুঝেই মাত্র একমাসের মধ্যেই ডুবে গেল অনুষ্ঠানের পেছনে। সেই আমাদের কলেজের প্রথম বাইশে শ্রাবণ পালন। সেই আমাদের শুরু হল। তারপর কতকিছু যে করে ফেলেছে আমাদের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' , সে কথা বলে বাড়তি জায়গা নেব না।

২

এক জীবনে অনেক জীবন। আমাদের জীবনে সবার (যেকোনও জীবনে, তা শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, সংসারজীবন, ভ্রমণজীবন) যা কিছু ক্ষেত্রেই একটা করে 'টিম' তৈরি হয়। আদিম যুগ থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যাপন করে এসেছে। দলের বাইরে নির্দল কেবল ব্যর্থ প্রেমিকেরাই থাকলেও হতে পারে।

সে আমি জানি না।

আমাদেরও একটি টিম ছিল। গোটা বিভাগের সঙ্গে পরিচয় কখনই হয়ে ওঠে না কারও। মুখ চিনতে চিনতেই বছর গড়িয়ে যায়। কিন্তু যাদের আমরা খুব কাছে পেয়ে যাই, বছর গড়িয়ে গিয়ে উল্টেপাল্টে গেলেও ভুলিনা। (নামগুলো লিখছি না, নইলে মস্ত কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। রসিক পাঠক মাত্রেই জানবেন।)

সেই আমরা, গোটা কলেজে চষে বেরিয়েছি। লাইব্রেরীতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে বলতে বই দেখেছি। অবশ্যই সাইলেন্ট ছিল সে কথার স্বর। লাইব্রেরীর ভেতরে নিজেরা গিয়ে বই খুঁজেছি পরীক্ষার আগে। সেদিনের কথা বলি।

আমার সিলেবাস মনে থাকে না কখনও। এত কিছু ছিল তাতে, কোন সেমিস্টারে কী ছিল তা স্পষ্ট বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমরা বই খুঁজতে গেলে আমাদের বলা হল, পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা কঙ্কা ম্যামকে জানালাম, আমরা খুঁজে দেখি যদি পাই। অনুমতি পাওয়া গেল। তবে চারজনের বেশি ভেতরে যাওয়ার ভিসা পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনজন আর এই অধম গিয়ে খুঁজতে লাগলাম বই। বই দেখলে আমি নিজেকে সংযত এখনও রাখতে পারি না। বই অপহরণ করতে না পারলেও ছুঁয়ে দেখতে ভুলি না। কত্ত কত্ত বই! এতগুলো বুক সেল্ফ ভরা বই দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছি। পৃথিবীর অর্ধেক বিষয় সম্পর্কে জানতে গেলে লাইব্রেরী যাওয়ার মতো বিকল্প নেই। 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাস লেখায় বিভূতিভূষণবাবুর আফ্রিকায় না গিয়ে, না দেখায় দেখে যে শঙ্করের আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই আমরা চমকে উঠি। কতকিছু বিষয় যে থাকতে পারে পৃথিবীতে তাকেই তো অনুসন্ধান করতে চায় চোখ। এখনও অনেকে, কোনও গল্প কে লিখেছেন বললে জবাব দেয়, কবিটার নাম যেন কী ছিল?

কাব্যগ্রন্থ কী?

গল্পের বইকে বলে কাব্যগ্রন্থ।

কত আজব প্রশ্ন আর উত্তরের দেখা মেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র শিক্ষাজীবনে। তো সেই লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রচুর বই দেখেছি। কত মস্ত বই দেখে পুলকিত হয়েছি। জেনেছি। চিনেছি কত লেখকদের। তখনও করেছি, এখনও আপশোস করি, যখন কোনও লেখকের নামই শুনিনি বলে। লজ্জায় পারদ হয়ে যাই।

আপনি অবশ্যই লাইব্রেরীতে সময় কাটান। আমরা কাটিয়েছি। কত কাটানোর বাকি রয়ে গেছে!

৩

আমরা স্নাতক হওয়ার জন্যেই কলেজে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু আমরা অর্ধেক স্নান করেছি আর অর্ধেক স্নান না করেই গা মুছে ফেলেছি। দেড় বছর যে কী ভীষণ চমৎকার দিন কাটিয়েছি, সে কথা আমাদের ফোনের গ্যালারিতে কিছুটা দেখা গেলেও যেতে পারে আর বাকিসব আমাদের লঘু মস্তিষ্কে স্টোর হয়ে আছে। সেসব দেখানো সম্ভবত সম্ভব নয়।

বাইশে শ্রাবণ নিয়ে কথা হয়ে গেছে। এরপরেও কী কী করার সুযোগ পেয়েছি আমাদের অর্ধেক কলেজ জীবনে, বলি? আচ্ছা বলি। বসন্ত উৎসব। শুধুমাত্র বাংলা বিভাগ থেকে বসন্ত উৎসব বহুবছর পরে আমাদের হাত ধরেই আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। সে কী আয়োজন! এখনও সেসব নিতান্তই সামান্য মনে হতেই পারে। কিন্তু নিজেকে কখনও ভুলিয়ে দিতে চাই না যে সেটা আমাদের শুরুর সময়। কেবলমাত্র দায়িত্ব নেওয়ার সময়। সেই আনন্দ থেকে যাক আমাদের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতায়। বক্স ভাড়া করার জন্য দল মিলে চলে গেছি দিন বাজারে। আরও কত কী।

একুশে ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমাদের অন্যতম মুখ্য অনুষ্ঠান ছিল কলেজে। উনিশে, ঘরের ভেতরেই হয়েছিল। কিন্তু কুড়িতে এসে এর পরিধি বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রয়াত অধ্যক্ষ ডক্টর আব্দুর রজ্জাক মহাশয় আমাদের বিভাগের জন্য আনন্দিত হতেন। বুঝতাম সকলে, যখন তাঁর রুমে গিয়ে কোনও অনুমতি নিতে যেতাম। স্যার বলতেন, বাংলার ছেলেরা এসেছে।

তো সেবারে পদযাত্রা করা হয়েছিল কলেজের সামনের রাস্তায়। কেবলমাত্র বাংলা বিভাগের উদ্যোগে গোটা কলেজের সামিল হওয়া আমাদের কাছে আনন্দদায়ক অবশ্যই। কিন্তু দুঃখের ঘটনা সেই ছিল শেষবার। তারপর কলেজজীবনে এসে গেল করোনা ভাইরাস। লকডাউন। মাস্ক। স্যানিটাইজার ও ইত্যাদি।

৪
ইতিমধ্যে যা বলার জন্য অপেক্ষা করে আছি সেটুকু বলার সময় এসে গেছে। সেটুকু বলে দিতে পারলেই আমি হালকা হব।

আমাদের টিম ছিল বলেছি। আমাদের ছ'জনের যে টিম ছিল তা এখন বলি। আপনি কি গুপ্তধন আবিষ্কার করতে চান? তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।

কলেজের পেছনে একটা বিরাট জঙ্গল আছে। লক্ষ্য করতে পারেন। যেদিকে বয়েজ হোস্টেল। আমরা ওই দিকের জঙ্গলটায় প্রায়ই যেতাম। পাশে একটা ফাঁকা জমি আছে। এইরকম শীতের রোদ্দুরে ক্রিকেট খেলেছি কত! হোস্টেলের পাশ দিয়ে একটা জঙ্গুলে পথ আছে। সেই পথ ধরে একটু এগোলেই বাঁদিকে একটা জংলি বন্ধ দ্বার দেখতে পাবেন। যেদিন আমরা গিয়েছি আমরা সবাই সেটা টপকে পার পেয়ে গেলেও, একজনের প্যান্ট ফেঁসে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি সচেতন থাকবেন। তারপর যখন রাস্তায় নামবেন তখন হাঁটতে থাকবেন সোজা। ধীরে ধীরে আপনার সামনে উন্মোচন হবে একটা নদীর ধারের মাঠ। একটা নদী। সেদিন আমরা নদীর ধারে বহুক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আর হয় না সেসব। হয়তো হবেও না।
আমাদের খাওয়ার জন্য কলেজের পাশে অনেক দোকান থাকলেও, আমরা আজও পছন্দ করি কাঁঠালতলার পরোটা খেতে। বড় প্লেটে একটা বড় পরোটা, লংকার আচার, আমের আচার, স্যালাড, তরকারি আর ছিল ইচ্ছেমতো সস্ নেওয়ার সুখ। কত যে খরচ করে ফেলেছি পরোটায়। হিসেব করলে একসেট রবীন্দ্ররচনাবলী কিনে নিতে পারতাম! যাক, যা গেছে তা যাক। আপশোস নেই। আনন্দ আছে।

৫
প্রিয় আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়,
তোমার ছায়ায় যে ক'টা দিন কাটানোর সুযোগ হয়েছে ভুলব না কখনও। তোমার কাছে আমাদের কত কথা রাখা আছে। সম্মাননীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে প্রথম দিনের পর সেই ঝাপসা আলাপ কত গভীর, কত আত্মিক হয়ে উঠেছে ক্রমে। কত চেনা হয়ে উঠেছি। শ্রদ্ধা করা কত সহজ হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার মানুষদের কত কথা আজও মেনে চলি। কিছু কথা আজও বাণীর মতো গেঁথে আছে আমার মধ্যে। প্রায়ই সেসব ব্যবহারও করি। যে ক'টা ক্ষণ তোমার সান্নিধ্য পেয়েছি, আরও চিনেছি নিজেকে। নতুনভাবে। যে শিখেছি তা নিয়ে আমি আজও ছড়া কেটে বলি,

যা আছে ললেজে

শিখেছি সব কলেজে।

ক্লাস রুম। বন্ধু -বান্ধবী। মাঠ। নদী। জঙ্গল। খেলার ব্যাট বল। জেরক্স। অচেনা বন্ধু। চা। পরোটা। আড্ডা। লাইব্রেরী। উৎসব। দায়িত্ব। হিসেব। কয়েক জোড়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সেলফি। আর একটা আঠাশ নম্বর রুম আমাদের ছিল। আমি স্মৃতিকাতুরে হয়ে পড়ি। কৃতজ্ঞতা এসি কলেজ। আমাদের আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়।

শেষে বলি, সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছি কিনা জানি না, কিন্তু সকলেই প্রিয় হয়ে উঠেছেন। আজ বলতে দ্বিধা নেই।

স্মৃতি সমাপ্ত হয় না। বলতে পারার ধরণটা ছাড়া আর কোনও কিছুই কাকতলীয় নয়।

Resonance of Tagore's Philosophy in World Economic Forum

Sudip Chakraborty
Associate Professor , Economics Department

At Beginning of this year, the World Economic Forum's annual meeting at Davos in Switzerland, global leaders voiced a concern for the world. Fragmentation of the world is causing harm to human race. The Forum calls for greater cooperation among nation states to solve the problems faced by humanity anywhere in the world. Problems faced by the citizens of nation states are not in, all cases, being created within their national boundaries. Those are created elsewhere outside their geographical territories. Sovereign states are failing to allay the sufferings of their citizens for the causes that are beyond their control. Take the cases of sub-Saharan Africa at the moment. Ethiopia, Somalia, Mali and Sudan are now suffering from severe food crisis. Peoples are dying for lack of food. Widespread famine in Sub- Saharan Africa is just knocking at their doors. These countries are poor but their poverty is being deepened in recent times by climate change. The IMF has recently said that these African countries are suffering worst-ever food crisis in recent years because of climate change. These poor nation states are not causing climate change; the villains are the rich industrialized countries of the west closely followed by emerging economies. 'Nation first' is the call of their national leaders. GDP growth at any cost is the goal. National pride is the top most priority. Two global wars have been fought in pursuit of macho nationalism. Humanity has suffered. Problems are local but their creators are countries far away from their geographies. Take another example of ongoing war in Ukraine triggered by Russian invasion. National pride is the driving cause for the war. Russia or the NATO, it's the show of power. Many countries are suffering from 3Fs crisis as a result of the war: food, fertilizer and fuel. Sudden rise in cost of living caused by the Ukrainian war has brought unspeakable miseries to millions of people all over the world. So we need a global solution for local problems, whether it's climate change or the war in Ukraine. It's time for us reflect on the cruelties of macho nationalism. We fought two global wars in the last century in the name of nationalism. Humanity has immensely suffered from the pursuit of nationalism. We are fortunate till date that after first and second, third world war has not taken place to destroy humanity. But the local and regional wars, internal strife, communal riots, ethnic cleansing, terrorism have killed millions of our fellow beings on this planet so far. The call at the WEF meeting to end fragmentation resonates with what Gurudev Rabindranath Tagore's philosophy of internationalism. Tagore voiced his concern against fragmentation of world humanity into pieces of nation states sited within geographical boundaries. Theses nation states pursue nationalism as the sole motive of national life. Tagore's idea of internationalism is not about global governance dismantling of all nation states and surrendering national sovereignty to a global authority. His philosophy of internationalism centers around cooperation, understanding, mutual respect and pursuit of unity of mankind . Fragmentation in the name of nation or race: America first, Brexit, white supremacy, xenophobia, racism are no less dangerous to the humanity than any global epidemic like the corona in recent times. Almost hundred years ago, Tagore lectured in Japan on disastrous side of nationalism. His idea of internationalism calls for more global inter- connectedness in place of fragmentation, more unity in place of isolation.

Results of the students of 2021-22

	Honours/ Programme	Total No. of Students appeared in Final Exam	No of Students obtained above 60% marks	Highest Percentage
01	BNGH	66	66	81.33%
02	ENGH	58	53	80.00%
03	HISH	40	39	80.67%
04	PHIH	26	26	75.67%
05	PLSH	72	54	75.33%
06	EDCH	30	30	93.67%
07	SOCH	29	29	86%
08	GEOH	21	21	79.33%
09	ECOH	12	12	86.00%
10	SANH	38	38	85.67%
11	PHSH	11	09	89.33%
12	CEMH	13	13	90.67%
13	BOTH	06	06	88.33%
14	ZOOH	12	11	84.33%
15	PHYH	19	18	95.67%
16	CMSH	22	22	92.33%
17	MCBH	22	21	92.67%
18	MTMH	22	22	90.33%
19	B.Sc (Gen)	64	62	84.33%